পিলি কোঠি

রেলগাড়িটা ককাতে ককাতে আরও কিছু দূর গিয়ে ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ শব্দে ঝাঁকানি দিয়ে থেমে গেল। যেন অবাধ্য অদূরদর্শী দস্যি ছেলেকে হ্যাঁচকা টানে থামিয়ে দিল কেউ নিদারুণ গোঁয়ার্তুমির মুখে। গোঁয়ার্তুমি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে একে ! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় জল, শুধু জল। গঙ্গা, পুন্‌পুন্ আর শোন - এই তিন নদী একজোট হয়ে মাঝেমধ্যে অন্য যা কিছু ছিল গ্রাম-শহর-বস্তি সব চেটেপুটে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এখন যেদিকে তাকাও শুধু জলরেখা ধূ-ধূ করছে চতুর্দিকে। গার্ড সাহেব ট্রেনের কামরায় কামরায় এই বার্তা শুনিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি আর আগে যেতে পারবে না জল না শুকোনো পর্যন্ত। জল শুকোলে লাইন-টাইন সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখেশুনে তবেই আবার যাত্রা শুরু। সে যে কবে তা বলা যাবে না এখন, জল এখনও উঠতির মুখে।

যাত্রীরা হৈ হৈ করে ওঠে, "আমরা যাবো কোথায়?"

"কোথায় আবার ! এখানেই এঁটে বসে থাকো ক'দিন। পুরু ইস্পাতের মজবুত বগি, এ তল্লাটে এখন এটাই নিরাপদ ঠাঁই। জল না বাড়লে।"

"তা বক্সার কি মোগলসরাইয়ে থামলেই তো পারতে ! এখন এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এতগুলো লোক থাকবে কি খেয়ে? গাড়ি আগে যাবে না যখন সেখানেই থেকে যেতাম আমরা। শহর বাজারে কিছু না কিছু জুটতো।" লোকগুলো ক্ষেপে ওঠে।

গার্ড সাহেব সবিনয়ে শান্ত করার চেষ্টা করে সবাইকে। কিন্তু ফল হয় না। যাত্রীরা একজোটে নেমে পড়ে।

ঘুঁষি পাকিয়ে চেল্লাতে থাকে , "গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলো। আমরা বক্সারে যেতে চাই। এই মাঠের মধ্যে ইঁদুরের মত ডুবিয়ে মারবে ভেবেছ?"

ড্রাইভার করজোড়ে বলে, "ঘাবড়াবেন না। আমি এক্ষুণি গাড়িকে উল্টো দিকে ছুটিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যে যার কামরায় উঠে পড়ুন দয়া করে।"

অবশ্য "ছুটিয়ে দিচ্ছি" বললেও গাড়ি মোটেও ছুটে চলে না। ককাতে ককাতে শৃঙ্খলিত ভারী ডিবেগুলো কষ্টে টেনে টেনে চলে উল্টোমুখী হয়ে। এবং কয়েক ঘণ্টা পরে অনেক আগে ছেড়ে যাওয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পুনঃপ্রবেশ করে। যাত্রীরা দুদ্দাড় করে নেমে পড়ে অনেকে, আবার কেউ কেউ জিনিসপত্র মোটঘাট আগলে বসে থাকে সঙ্গী-সাথীদের খোরাকের খোঁজে পাঠিয়ে।

"চায় চাহিয়ে মাইজী?"

চমকে চেয়ে দেখি বিরাট একটা কেটলি জানলার কাছে তুলে ধরে চা-ওলা জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রয়েছে। ফ্লাস্কে চা ভরে নিয়ে দাম মিটিয়ে দিতে গিয়ে দেখি খুচরো পয়সা নেই। দশ টাকার নোট দিলাম। চা-ওলা পকেট হাতড়ে বাকী পয়সা গুনে দিলো।

পয়সাগুলো হাতে নিয়ে শুধোলাম, "এদিকে বন্যা হয়নি?"

লোকটা দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে কার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বললো, "বলছো কি মাইজী ! গ্রামকে গ্রাম গোরু-বাছুর-মোষ ভেসে গেছে, কত মানুষ-জন গৃহহারা হয়েছে তার হিসেব নেই। মরেছেও বহু। মাত্র ক'দিন আগে জল সরেছে শহর থেকে।"

বললাম, "ওদিকে তো জল এখনও উঠতির মুখে।"

চা-ওলা বললো, "তিন সতীনে পালা করে খেল দেখাচ্ছে মাইজী। একজন একটু নরম হয় তো আরেকজন রুদ্রমূর্তি ধরে, মধ্যে থেকে আমরা গরীবরা ধনে-প্রাণে বরবাদ হয়ে গেলাম।"

কেটলি হাতে অন্য খদ্দেরের খোঁজে হাঁক পাড়তে পাড়তে এগিয়ে যায় লোকটা।

সঙ্গে কিছু খাবার আছে। এক্ষুণি রসদ সঞ্চয়ের তাগিদ নেই তাই। তবু দু'একদিন যদি এখানেই পড়ে থাকতে হয় খাবার-দাবার কিছু জোগাড় থাকাই ভালো। কিছু দূরে একটা ছোকরা "ডবলরোটি - বান -

ডবলরোটি" হাঁকতে হাঁকতে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে দু'পাউণ্ড পাঁউরুটি আর এক ডজন বান কিনলাম। এক ডজন কলাও জোগাড় করলাম ফলওলার কাছ থেকে। বন্যার জন্যে কিংবা আমাদের হঠাৎ আগমনে জানি না, প্রত্যেকটি বস্তুরই আকাশ ছোঁয়া দাম। কিন্তু যাত্রীরা নিরুপায়, তাই কিনছে বাধ্য হয়ে। কে জানে, এরপর হয়তো এও জুটবে না।

অদূরে হলুদ সাইনবোর্ডটা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাকে।

ডানদিকে লোহার গেট পার হলেই পীচঢালা রাস্তা, ধূলো-কাদার তলায় চাপা পড়ে গেছে। স্টেশনের বাইরে একদিকে লাইন দেওয়া রিক্সার ভিড়, অন্যদিকে এক্কা আর ছ্যাকড়া গাড়ি। কে জানে হয়তো ট্যাক্সিরও চল হয়েছে এতদিনে। স্টেশনের বাইরে একটা বড় বটগাছ ছিল আগে। সেটা এখনও আছে হয়তো। সেই বটগাছ পার হয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরে মাইল দেড়েক গেলেই পড়তো বিরাট কমপাউণ্ডওলা একটা বড় হলদে রঙের দোতলা বাড়ি। চৌধুরীদের 'পিলি কোঠি'। প্রকাণ্ড বড় বড় আম-জাম-তেঁতুল-তুঁত গাছের ছায়ায় দিনের বেলাতেও সেখানে আধো অন্ধকার হয়ে থাকতো। সেইসব গাছ-গাছড়া ছাড়িয়ে লম্বা রাস্তা চলে যেতো পিলি কোঠির জাফ্রি কাটা গাড়ি বারান্দায়। পাড়ার অন্য বাড়িগুলো থেকে নিজেদের তফাতে রাখতো পিলি কোঠির বাসিন্দারা। হয়তো টাকার পাঁচিলই তাদের অমন আলাদা করে আগলে ঘিরে রেখেছিল আশেপাশের সাধারণ মধ্যবিত্ত পাড়া-প্রতিবেশীদের স্পর্শ বাঁচিয়ে।

কিন্তু সে কথা বোধগম্য করার মত বোধশক্তি আমার সে বয়সে ছিল না। তাদের দূরত্বই আমাকে আকৃষ্ট করতো বারে বারে। খেলতে খেলতে কতবার ও বাড়ির কদাচিৎ-খোলা জানলার পানে চেয়ে খেলা ভুলে দাঁড়িয়ে থেকেছি নির্নিমেষে। কত সব আজগুবি কল্পনা করতাম ও বাড়ির লোকগুলোকে নিয়ে। এ ব্যাপারে আমি একা ছিলাম না। পাড়ার ছেলে-বুড়ো, মহিলা-পুরুষ সবাই পিলি কোঠিকে এক অদ্ভুত নজরে দেখতো। পাশের বাড়ির চাচিদের সঙ্গে মাকে গল্পগুজব করতে শুনেছি, তাদের নীচু-গলার সতর্ক কথাবার্তায় কি এক রহস্যময় বিস্ময়ের ছোঁয়া পেতাম।

আমার খেলার সাথী বাচ্চিকে শুধোলে সে বিজ্ঞের স্বরে বলতো, "ও

হরি, তুই জানিস না বুঝি? ও বাড়ির ছোটি বহু একটা চুড়েল।"

"ছোটি বহু মানে? ক'টা বহু আছে ও বাড়িতে?"

ও বিরক্ত হয়ে বলতো, "একজনই আছে এবং সে-ই ছোটি বহু। আগে শ্বশুর-শাশুড়ির আমলে হয়তো নামটা চালু হয়েছিল। এখন সেটাই পাকা হয়ে গেছে। সে যাই হোক, বউটা মোটেই ভাল নয়। দস্তুরমত ডাইনি।"

"তুই জানলি কি করে?"

"সবাই জানে এ কথা। শনিবার রাত দুপুরে বাড়ির পিছনে আমবাগানে নাচে। ভূত-প্রেত সব জমায়েৎ হয় সেখানে ----।"

"তুই দেখেছিস?"

"দেখতে নেই সে সেব। দেখলেনির্ঘাত কিছু ক্ষতি হয় তার। শিব্বন কাহারের জোয়ান ছেলেটা দেখেছিল। তারপর সে কি বেঘোর জ্বর! ভিন্ গাঁ থেকে ওঝা এসে কত ঝাড়ফুঁক করলো, কিছুতেই বাঁচানো গেল না তাকে।"

"নাচ দেখে হয়েছিল, কি করে জানলো সবাই? শিব্বন কাহারের ছেলের আর তো জ্ঞান হয়নি, সেই বেঘোর অবস্থাতেই তো মরে গেল।"

বাচ্চি বললো, "তুই একটা বুদ্ধু। ওঝাদের এসব বলতে হয় না। ওরা নিজেই টের পায়। শিব্বন কাহারের বাড়ি কত পুজো-পাঠ হল, কত তন্ত্র-মন্ত্র করলো। তোর মা তোকে যেতে দেয়নি, কিন্তু আমি গেছিলাম। সে কি ভিড় তাদের ঝোপড়ি ঘিরে। ছেলের মড়া আগলে বসে রইলো শিব্বন। বললো ছেলে তো গেছেই, কিন্তু ছেলেটাকে কে খেয়েছে সে আমি বার করবোই। তিন প্রহর অবধি মন্ত্র পড়ে চললো ওঝা। তারপর মন্ত্র পড়তে পড়তে একটা ভাঁজ করা কলাপাতা ছেলের বাপকে এগিয়ে দিয়ে বললো - খুলে দেখ। খুলে দেখে শিব্বনের তো চক্ষু স্থির ! কলাপাতায় পিলি কোঠির ছোটি বহুর মুখ। কানের কানবালা, নাকের নাকছবি, কপালের বিন্দি - কিচ্ছু বাদ পড়েনি, এমন নিখুঁত ছবিখানা।"

"তারপর শিব্বন কাহার কি করলো?"

বাচ্চি ঠোঁট উল্টে বললো, "কি আবার করবে। তুই জানিস না চুড়েলদের কি সাংঘাতিক ক্ষমতা। মানুষকে ভেড়া বানিয়ে দিতে পারে। সবকিছু ভুলিয়ে দিতে পারে। শিব্বন কাহারকেও সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। এখন সে পিলি কোঠিতে ফাই ফরমাস খাটে।"

বাচ্চি বলেছিল, "প্রতি শনিবার রাত্রে নাকি আমবাগানে রাতদুপুরে আদুরগায়ে নাচে ছোটি বহু। আর যে শনিবার অমাবস্যা পড়ে, সে রাতে আর আমবাগানেও কুলোয় না তার। গঙ্গার ধার ঘেঁষে শ্মশানঘাটে চলে যায়। কোনও সদ্যমৃত মড়া পেলে, তাকে জাগিয়ে তুলে সঙ্গী করে যুগল নৃত্য করে রাতভোর। তা না পেলে গোরস্থানে গিয়ে শুধু হাতে মাটি খাবলে ভিতর থেকে তাজা দেখে শব বার করে। আর যে দিন তাও জোটে না ---- " বাচ্চি সভয়ে চোখ বন্ধ করে শিউরে ওঠে।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, "আর যেদিন তাও জোটে না? বল না বাচ্চি, কি হয় সেদিন?"

বাচ্চি বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে চেয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে, "কিছু না পেলে নিজেই মড়া তৈরি করে জ্যান্ত মানুষ মেরে। অমাবস্যার শনিবারে মড়া ছাড়া চলে না চুড়েলদের। তা না হলে ওদের নফর ভূত-প্রেতগুলো ওদেরই রক্ত খেয়ে নেয় ঘাড় মটকিয়ে।"

এর কিছুদিন পরে পিলি কোঠিতে পদার্পণ করার সুযোগ ঘটে গেল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। আমার বাবা সরকারী ডাক্তার ছিলেন। কার্যোপলক্ষে কয়েক বছর বক্সারে থেকে শেষে রিটায়ার করে সেখানেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ সুরু করেন এবং ক্রমে বেশ ভালই পসার হয় তাঁর। আমার "জন্ম - কর্ম্ম - সবকিছু" বক্সারে না হলেও জীবনের অনেকখানিই কেটেছে সেখানে। যা বলছিলাম। সঙ্গী-সাথীদের কাছে শুনে এবং বড়দের ভাসাভাসা গোপন কথাবার্তা কিছু কিছু কানে এসে যেটুকু জেনেছিলাম তার উপর কল্পনার তুলি বুলিয়ে পিলি কোঠি সম্বন্ধে একটা আধা-পার্থিব, আধা-ভৌতিক জগৎ মনে মনে এঁকে নিয়েছিলাম। কোনদিন সে জগতে প্রবেশ করবো ভাবিনি। হঠাৎই সুযোগ এসে গেল।

বিকেলে জামাকাপড় পাল্টে জলখাবার খেয়ে বাড়ির বাইরে আনমনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার খেলার সাথী বাচ্চির আজ বাইরে আসা মানা। ওর হবু সসুরাল থেকে কারা নাকি আসবে। আমার মা আমার যার-তার সঙ্গে খেলা বা একা একা এখানে-ওখানে যাওয়া পছন্দ করতেন না। বাচ্চির বাবা আমার বাবার কম্পাউণ্ডার ছিলেন এবং আমাদের বাড়ির পাশেই ওদের বাড়ি। এই জন্যে ওর সঙ্গে মেলামেশাতেই শুধু অবাধ স্বাধীনতা ছিল আমার। বাচ্চির অনুপস্থিতিতে তাই বেশ মুষড়ে

পড়েছিলাম। নিশ্চয়ই ম্লান দেখাচ্ছিল মুখখানা। বাবা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে তাঁর চেম্বার থেকে কলে যেতে যেতে দেখেছিলেন সেটা, আর তাঁর মনকে হয়তো নাড়া দিয়েছিল তাঁর একমাত্র সন্তানের সঙ্গীহীন একাকীত্ব। গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাতে বলে জানলা দিয়ে মুখ বার করে ডাকলেন।

আমি একছুটে কাছে যেতে দরজা খুলে পাশে বসিয়ে বললেন, "আয়, এক জায়গায় নিয়ে যাবো।"

রুদ্ধশ্বাসে বললাম, "কোথায় বাবা? কোথায়?"

বাবা মুখ টিপে হেসে তর্জনি নির্দেশ করে সামনের প্রকাণ্ড বাড়িখানা দেখালেন; তারপর আমার বিস্ময়ে হতবাক মুখ দেখে বললেন, "কি হল, যাবি না?"

দ্রুতবেগে মাথা নেড়ে জানালাম, "যাবো।"

গাড়ি ততক্ষণে পিলি কোঠির গেট পার হয়ে বিরাট গাছপালা ছাওয়া কম্পাউণ্ডে ঢুকেছে। গাড়ির শব্দে বারান্দায় দু'জন চাকর ছুটে এলো। তাদের পিছনে একজন জীর্ণ শীর্ণ প্রৌঢ় ভদ্রলোক। জরিপাড় পাতলা ফিনফিনে ধুতি পরনে। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবীর তলা থেকে চিক্‌চিক্ করছে একছড়া ভারী সোনার হার। পাঞ্জাবীর বোতামের পাথরগুলো জোনাকীর মত আলো ছড়াচ্ছে। রুদ্রনারায়ণ - পিলি কোঠির মালিক এবং ছোটি বহুর পতিদেব। বাচ্চির কাছে শুনেছি, প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী উনি। দোর্দণ্ডপ্রতাপ পরাক্রমশালী লোক। এক কালে এঁর দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেতো নাকি। চেহারাও ছিল তেমনি। সকাল বিকেল বাদাম-কিসমিস-ছোহারা-আখরোট-চিরঞ্জি খেয়ে কুস্তিগীরদের সঙ্গে কুস্তি খেলতেন। দু'জন পালোয়ানে তেল মালিশ করতো ঘণ্টাভর ধরে। এঁর প্রথম স্ত্রী ছিলেন উত্তর বিহারের বিখ্যাত জমিদার বংশের মেয়ে। যেমন দেবী প্রতিমার মত চেহারা, তেমনি সুন্দর অমায়িক স্বভাব।

কিন্তু রুদ্রনারায়ণের কপাল মন্দ। প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেল বড়ি বহু। স্ত্রীর শোক ভুলতে রুদ্রনারায়ণ শিকার-কুস্তি-সাঁতার -খেলাধূলোয় আরও বেশী করে ডুবিয়ে দিলেন নিজেকে। তাঁর মা তখনও জীবিতা। মায়ের কান্নাকাটিতেই দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে সম্মত হলেন

রুদ্রনারায়ণ। আর দুধের ছেলেটির মুখ চেয়ে। পিলি কোঠিতে ছোটি বহুর আগমন হল। রুদ্রনারায়ণের মা নাকি কিছুদিনের মধ্যেই সব টের পেয়ে যান এবং বিয়ে দিয়ে এক চুড়েলকে সেধে তাঁর সাধের সংসারে ঢুকিয়েছেন এই নিদারুণ তথ্য আবিষ্কারের আকস্মিক আঘাতে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েন। এর কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

অনেকে বলে নতুন বউয়েরও কিছুটা কারসাজি আছে এতে। শাশুড়ি তার জারিজুরি ভেঙে দেবার আগেই সরিয়ে দিয়েছে তাকে। রুদ্রনারায়ণেরও দ্রুত স্বাস্থ্যহানি ঘটতে থাকে। পাড়া-প্রতিবেশীরা কানাকানি করে। ডাকিনী বউকে নিয়ে ঘর করা, সে বউ বুকে বসে রক্ত শুষে নেয় তিল তিল করে। আফিমের মত রক্তমজ্জায় মিশে যায় তার কাল কুহকের বিষ ----। সকলের সব অপবাদ সত্য প্রমাণ করতেই যেন রুদ্রনারায়ণের তেজদীপ্ত দু'চোখের তলে কালি নামে, দম্ভ দৃপ্ত চিবুক ঝুলে পড়ে শিথিল হয়ে। অমন স্বাস্থ্যবান মানুষটা শীর্ণ মলিন হয়ে যায় দিনে দিনে ----।

শুধু বাচ্চি নয়, বড়দের মুখেও শুনেছি এ কথা বহুবার। সেই রুদ্রনারায়ণ আজ নিজে এসে দাঁড়িয়েছেন আমাদের অভ্যর্থনা করতে।

এগিয়ে এসে দু'হাতে বাবার দু'টো হাত চেপে ধরে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "ডাক্টর সাহাব, আমার ছেলেকে বাঁচাও। আজীবন কেনা গোলাম হয়ে থাকবো তোমার ----" রুদ্রনারায়ণের গলা বুঁজে এলো।

বাবা সসম্ভ্রমে বললেন, "ঘাবড়াবেন না চৌধুরী সাহেব। আমার যথাসাধ্য করবো। ছেলে নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে।"

ওদের সঙ্গে অন্দর মহলে ঢুকলাম। ঘরের পর ঘর; আর কি সুন্দর আসবাবপত্রে সাজানো সে সব। সবশেষে চারিদিকে পর্দাটানা একটা ঘরে ঢুকলাম। কারুকার্য করা রূপোর বাতিদানে নীল কাচে ঘেরা আবছা আলো। প্রকাণ্ড পালঙ্কে আমারই সমবয়সী একটি ছেলে বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। দু'চোখে অপ্রকৃতস্থ দৃষ্টি। মাথার কাছে একটি মহিলা বসে ছেলেটির মাথায়-বুকে হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করছে।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। এই তো সেই ছোটি বহু! ভ্রমরকৃষ্ণ জোড়াভুরু অবধি ঘোমটা টানা। পানের মত মুখ। ঠোঁট দুটি যেন কোন

শিল্পী বহু যত্নে এঁকেছে অনেকক্ষণ ধরে। মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে রেখেছে পুরুষদের দৃষ্টির আড়ালে।

বাবা চাকর দু'জনের দিকে চেয়ে বললেন, "আলো আনো।"

ওরা দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা গ্যাসের লণ্ঠন নিয়ে এলো।

ছেলেটা চিৎকার করে তর্জন করে উঠলো, "পাজী বদমাইস কোথাকার ! শীগ্‌গীর আলো নেবা। যারা আমাকে নিতে এসেছে আলোকে তারা ভয় পায় জানিস না? এক্ষুনি যেতে হবে আমায় ----।"

বিছানা ছেড়ে ওঠার উপক্রম করতে, রুদ্রনারায়ণ আর ছোটি বহু ওকে দু'দিক থেকে চেপে ধরলেন, "কি হয়েছে সোনা, এই তো আমরা।"

ছেলে ওদের ঠেলে সরিয়ে দিতে চায়।

চোখ পাকিয়ে বলে, "খবরদার, আমাকে আটকানোর চেষ্টা কোরো না। ওরা কখন থেকে অপেক্ষা করছে। দেরী হয়ে যাচ্ছে আমার ----।"

ঝাপ্‌টাঝাপ্‌টিতে ছোটি বহুর ঘোমটা খুলে গেল। আশ্চর্য সুন্দর টানা টানা দুটি চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে দু'গাল বেয়ে।

বাবা ততক্ষণে ব্যাগ খুলে সিরিঞ্জে ওষুধ ভরেছেন। সবাই মিলে ছেলেটাকে - পরে জেনেছিলাম তার নাম কুমার রূপনারায়ণ - চেপে শুইয়ে রাখলো। বাবা ইনজেক্‌শন দিলেন। ক্রমে নিস্তেজ হয়ে এলিয়ে পড়লো ছেলেটা। অনেকক্ষণ ধরে রুগী দেখলেন বাবা। বললেন, ওর টাইফয়েড হয়েছে। তবে ভয়ের কিছু নেই। ওষুধপত্তরগুলো সময়মত পড়লে এবং ঠিকমত সেবাযত্ন হলে নিশ্চয়ই সেরে উঠবে। অল্প বয়সের কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে কখন যে ছোটি বহুর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি নিজেই জানি না। ছোটি বহু প্রথমে লক্ষ্য করেনি। তার দু'চোখ বেয়ে অঝোরে জলের ধারা নেমে আসছে। চোখ মুছে আমার দিকে চাইলো। বাবা তখন চৌধুরী সাহেবকে রুগীর ওষুধপথ্য বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন।

ছোটি বহু আমার হাত ধরে করুণ কণ্ঠে বললো, "ভগবান ছোটদের কথা কখনো ফেলেন না। তুমি রোজ রাত্রে প্রার্থনা কোরো আমার ছেলে যেন সেরে ওঠে। আমার যে এ ছাড়া আর কেউ নেহ! ববুয়া সেরে উঠলে তোমায় সোনার হার গড়িয়ে দেবো আমি।"

ববুয়া সেরে উঠেছিল। বড় বড় চাঁদির থালা ভরে মিষ্টি এসেছিল পিলি কোঠি থেকে, আর এসেছিল নিমন্ত্রণ।

মা আড়ালে তর্জন করে বললেন, "না, আমি কিছুতেই পাঠাবো না টুনুকে।নির্ঘাত কিছু মতলব আছে মাগির।"

রাগলে মার মুখের আগল থাকতো না। শেষপর্যন্ত অবশ্য মাকে রাজী হ'তে হ'ল।

বাবা বললেন, "অত করে বলে পাঠিয়েছে যখন, না গেলে ভারী বিশ্রী দেখাবে। যথারীতি ফিস্ দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে। এরকম কত শক্ত শক্ত কেস আসে। রোগ ভাল হয়ে গেলে আর কেউ ডাক্তারকে মনেও রাখে না। এরা এত মিঠাইমণ্ডা পাঠিয়েছে চার-চারটে থালা ভর্তি করে, এর পর আমাদের তরফ থেকে অভদ্রতা সাজে না। তাছাড়া এই পাড়াতেই থাকতে হবে যখন।"

মা আমাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে পাঠালেন বটে, তবে সেই সঙ্গে ফ্রকের মধ্যে ঠাকুরের নির্মাল্য গুঁজে দিলেন। কপালে এঁকে দিলেন একটু বেঁকা করে কাজলের টিপ। ছোটি বহুর মুখে হাসি আর ধরে না। উঠোনে বসে সৎ-ছেলের খাওয়া তদারক করছিল। আমায় দেখে উঠে এসে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালো ববুয়ার পাশে। ববুয়া কাচের গ্লাসে কমলা লেবুর রস খাচ্ছিল। সামনের প্লেটে ছিল বেদানা, আঙুর আর ছানা। আমার জন্যে দাসীরা ভিতর থেকে রূপোর রেকাবী করে নারকোলের বরফি আর মিহিদানার লাড্ডু নিয়ে এলো। রূপোর তবক দেওয়া তাতে। আরও একরকম আশ্চর্য সুস্বাদু মিষ্টি, তার নাম জানি না। বাইরেটা গোলাপী রঙের চমচমের মত, ভিতরে রসে টইটুম্বুর। খাওয়া হলে রূপোর গেলাসে ঘোলের শরবৎ এলো, তাজা গোলাপের পাঁপড়ি দেওয়া। গোলাপ ফুলের গন্ধ যেন মুখের ভিতর দিয়ে মাথার মধ্যে চলে যাচ্ছিল। কেমন মাতাল মাতাল লাগছিল মাথাটা।

ছোটি বহু ববুয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল আমার।

ববুয়াকে বললো, "জানো এই খোকি তোমার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিল, যেন তোমার অসুখ তাড়াতাড়ি সেরে যায়। তাইতো এত অল্পের উপর দিয়ে গেল।"

এই বলে ববুয়াকে চুমু খেয়ে উঠে ভিতরে চলে গেল। খানিক বাদে

বেরিয়ে এলো একটা ভেল্ ভেটের ডিবে হাতে করে।

ডিবে খুলে আমার সামনে ধরে বললো, "এটা তোমার জন্যে। সেদিন বলেছিলাম না?"

সোনার হারখানা আলোয় চিক্ চিক্ করছে। আমার মুখে কথা সরলো না। সত্যি বলতে কি ববুয়ার জন্যে একবারও ঠাকুরকে বলিনি আমি। বেমালুম ভুলে গেছি। তাছাড়া ছোটি বহুর নিজেরই তো অত ক্ষমতা।

বাচ্চি বলে, "যা খুসি তাই করতে পারে ছোটি বহু , বড়-ছোট-মাঝারি কত ভূত-প্রেত-পিশাচরা তাঁবেদার তার।"

ইচ্ছে করলে সেই তো অসুখটা সারিয়ে দিতে পারতো। সে নিজেই রোগটার পিছনে কিনা, তাই বা কে বলতে পারে?

সোনার হারটা দেখে আমার ভারী অস্বস্তি, লজ্জা আর অপরাধবোধ হচ্ছিল। ভয়ও। এই হার নিয়ে বাড়ি গেলে আমার একখানা হাড়ও কি আর আস্ত রাখবে মা? কিন্তু সে কথা ছোটি বহুকে বলা যায় না। ঘাড় নীচু করে হার দুলিয়ে বাড়ি ফিরলাম। মা আমাকে কিছু বললেন না। হারখানা ঠাকুরঘরে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরের সিংহাসনে ছুঁইয়ে বাক্সে তুলে রাখলেন। পরে নাকি পুরুত ডেকে ভাল করে শুদ্ধি করিয়ে নিয়েছিলেন।

এর কিছুদিন পরে বাবা আমায় পাটনায় বোর্ডিং-স্কুলে ভর্তি করে এলেন। একেবারে নতুন জগতে প্রবেশ করলাম আমি। খেলাধূলো, অগুন্তি বন্ধু-বান্ধব, পড়াশোনা ও আরও কতরকম ব্যস্ততা। আশৈশবের নিঃসঙ্গতা পুরোপুরি ঘুচে গেল। স্কুলের শেষে ওখানেই সায়েন্স কলেজে ভর্তি হলাম। তারপর মেডিক্যাল কলেজ।

ছুটিছাটায় বাড়ি আসি, কিন্তু পুরনো আকর্ষণগুলো আর হাতছানি দেয় না আমায়। বাচ্চিও তখন আর নেই। বিয়ের বছর পাঁচেকের মধ্যে আধডজন-খানেক সন্তানের আমদানী করে ইহলোকের মায়া কাটিয়েছে। বাচ্চির মা'ও মারা গেছে কয়েক বছর হল। চাচাজী আছেন এখনও। বাচ্চির অবর্তমানে জামাই অপোগণ্ডগুলিকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে উঠেছিল অপারগ হয়ে। শাশুড়ি যদ্দিন ছিল তাদের দেখেছে শুনেছে, তারপর সে গত হতে পথে বসল সবাই।

অচল সংসারের হাল ধরতে জামাই আর একটা বউ আনলো। বাচ্চাগুলোর একটা হিল্লে হবে, বুড়ো শ্বশুরও শেষ বয়সে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাবে নিজের হাত না পুড়িয়ে - এই প্রত্যাশায়। কিন্তু কপাল মন্দ। অল্পবয়সী ডিগ্‌ডিগে যে মেয়েটি বউ হয়ে এলো, ক'দিন পরে তার স্বরূপ দেখে শ্বশুর-জামাই-বাচ্চাকাচ্চা তাবৎ পাড়াপ্রতিবেশী থরহরিকম্প। এ মেয়ে তো মেয়ে নয়, সাক্ষাৎ অগ্নিবর্ষী ড্রাগন ! মুখ দিয়ে আগুন বর্ষাচ্ছে অবিরত। আর কি রাগ, কি তেজ তার ! যেন পারলে কচ্‌কচ্‌ করে চিবিয়ে খেয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয় দোজবর বরের গোটা সংসারটাকে। আমাদের লাগোয়া বাড়ি। চব্বিশ ঘণ্টা বাচ্চির সতীনের কটকটে কথা আর দুমদাম, ধুপধাপ, ঘটাং-দড়াম ইত্যাকার কিল-চড়, ভাঙা-চোরা-ফেলার আওয়াজে কানে তালা লাগার দাখিল।

সারা পাড়াপ্রতিবেশী অতিষ্ঠ। সামনে কিছু বলার দুঃসাহস বা দুর্বুদ্ধি হয় না কারো। আড়ালে জটলা করে নানা কটুক্তি, সমালোচনা চালায় বউটার কান বাঁচিয়ে। পিলি কোঠির ছোটি বহু কোন অতলে তলিয়ে যায় বাচ্চির বরের নতুন "বহু"র দাপটের কাছে। কিন্তু পিলি কোঠি আমার মন থেকে তখনকার মত মুছে গেলেও, আমার জীবন থেকে মোছে না। আমার সুখ-শান্তি-স্বস্তি সব কিছু গ্রাস করে নেবার জন্যে নেপথ্যে অপেক্ষা করে সুযোগের প্রতীক্ষায়। আর আমি সরল বিশ্বাসে নির্বুদ্ধি হৃদয়ে এগিয়ে চলি আলেয়ার পিছে ----।

থার্ড ইয়ারে কুমার আর আমি প্রথম আবিষ্কার করলাম দু'জনে দু'জনকে। অথচ গত দু'আড়াই বছর ধরে একসঙ্গে ক্লাস করেছি, প্রফেসারদের সাথে সাথে হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘুরেছি বহুবার, একই গ্রুপে। বুঝি এরকমই হয়। হঠাৎ বদলে যায় সবকিছু। যাদুকর শিল্পীর তুলির রঙে সবকিছু একাকার হয়ে যায় মুহূর্তে ; সকল সঙ্কল্প-উচ্চাশা ভেসে যায়, মিশে যায়, ধেয়ে যায় নতুনের পানে।

সেবার ছুটিতে মা বললেন, "টুনু, তোর জন্যে সম্বন্ধ দেখছি আমরা। এক জায়গায় কথা এগিয়েছে অনেকটা। অ্যাদ্দিনে পাকা হয়ে যেতো, কিন্তু তোর বাবা তোর মত না নিয়ে দিন ফেলতে রাজি হলেন না।"

আমার সর্বশরীর কেঁপে উঠলো ত্রাসে আতঙ্কে।

কষ্টে কান্না চেপে বললাম, "তোমরা কি সবাই পাগল হলে নাকি? আসছে বছর আমার ফাইনাল পরীক্ষা না? এখন মহানন্দে পাত্র দেখে বেড়াচ্ছো?"

মা বললেন, "এ ছেলেও ডাক্তার। ওদের খুব আগ্রহ। তোকে পড়া শেষ করতে দেবে। চাই কি ডাক্তারী করতেও দেবে হয়তো। খুব শিক্ষিত পরিবার। সেকেলে গাঁইয়া-ঘরে মেয়ে দিচ্ছি নাকি?"

"শহুরে হোক, গাঁইয়া হোক, বিয়ে এখন আমি কিছুতেই করবো না।"

মা আরও কিছুক্ষণ লেগে রইলেন। শেষে বেগতিক বুঝে বাবাকে পাঠালেন আমার সঙ্গে দরবার করতে। বাবা অল্প কথার মানুষ, মা'র মত আবেগশীল নন।

আমার পড়াশোনার ইচ্ছা এবং সম্ভব হলে বিলেতযাত্রার উচ্চাশার কথা শুনে বললেন, "বেশ তো। এ তো আনন্দের কথা। এতে বাধা দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, উচিতও নয়।"

পিলি কোঠির কুমার রূপনারায়ণ, বহুবছর আগে দেখা সেই ববুয়া, সে আমার সহপাঠী হবে এবং আমার কুমারী হৃদয়ের একেশ্বর হয়ে উঠবে একদিন, কখনও কি ভেবেছিলাম তা? কুমার কিন্তু বলতো, ও নাকি সেই ছোটবেলা থেকেই মনে মনে বেছে নিয়েছিল আমাকে। সেই যেদিন শুনেছিল যে আমার প্রার্থনার ফলেই দুরারোগ্য টাইফয়েডে মরতে মরতে প্রাণ পেয়েছে। ছোটি বহুর আমার গলায় নিজের হাতে সোনার হার পরিয়ে দেবার ছবিটা নাকি কোনদিন ওর মন থেকে মুছে যায়নি।

বলতো, "কে জানে, ভাগ্যদেবতা সেদিনই হয়তো আমাদের গাঁঠছড়া বেঁধে দিলেন। তোমাকে চিহ্নিত করে রাখলেন আমার জন্যে।"

মেডিক্যাল কলেজে সাজগোজ, জবরজং গয়নাপত্তর পরার রেওয়াজ ছিল না। তবু কুমারের কথা শুনে ছুটিতে মায়ের কাছ থেকে ছোটি বহুর দেওয়া হারখানি চেয়ে নিলাম। এরপর সে হার কোনদিন খোলা হয়নি আর। সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পরও শেষ চিহ্ন হয়ে সকল বিস্মৃতি, বেদনার প্রতীক হয়ে আমার কণ্ঠ ঘিরে রয়েছে আজও।

ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। আগামীকাল বাড়ি ফিরবো। আমার রুমমেট এবং হস্টেলের অন্য বন্ধুরা হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে শহরময়। আমি চুপচাপ নিজের ঘরে বসে আছি। কুমারের সঙ্গে আজকের দিনটা কাটাবো কথা ছিল। শেষমুহূর্তে ওর আত্মীয়স্বজন কারা নাকি এসে উপস্থিত হয়েছে, ফোন করে এটুকুই জানিয়েছে কুমার।

অন্ধকার নেমে এসেছে অনেকক্ষণ। হস্টেলের করিডরে বাতি জ্বলছে। তারই আবছা আলোয় ঘরের মধ্যে আধো আলোকিত হয়ে আছে। অন্যমনস্ক হয়ে নানা কথা ভাবছিলাম। এবার বাড়ি গিয়ে কুমার সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবে। তার আগে অবশ্য ওকে তার বাবা-মা'র কাছে ভাঙতে হবে কথাটা। কিন্তু চৌধুরী সাহেব শুরুতে আপত্তি তুললেও, ছোটি বহু নিশ্চয়ই মত করাতে পারবে তাঁকে। ছোটি বহু তো সেই কবেই স্বীকৃতি দিয়েছে, সোনার হার পরিয়ে বরণ করে নিয়েছে আমায়। ছোটি বহুর স্নেহস্নিগ্ধ মুখখানার স্মৃতি সব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর করে দেয় নিশ্চিন্ত অভয়দানে ----।

দরজার বাইরে থেকে কে ডাকলো, "দিদিজী, আপকা ভিজিটর আয়া ----।"

দ্রুতপায়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে এসে দেখি, গেটের অদূরে দাঁড়িয়ে কুমার। বিজলী বাতির অপর্যাপ্ত আলোয় ওর মুখখানা ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে নির্জীব দেখালো। দু'চোখের দৃষ্টিতে যেন ডুবন্ত মানুষের হতাশা।

"কুমার, কি হয়েছে?"

ও কোন জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো। আমি ওর পাশে পাশে হাঁটতে লাগলাম। আধঘণ্টা খানেক কেটে গেছে। গঙ্গার ধারে এসে পৌঁছেছি আমরা। চারিদিকে কোথাও কেউ নেই। সামনে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে গঙ্গার পবিত্র সুগভীর জলধারা। কুমার থামলো।

আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাঁধের উপর দু'টো হাত রেখে গভীর আবেগভরা স্বরে ডাকলো, "টুনু ----।"

"বলো।"

"এসো টুনু আমরা দু'জন গঙ্গামাইয়ার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কোনদিন আর তোমাকে ছেড়ে যেতে হ'বে না তাহলে। তুমিও কখনো

আমায় ছেড়ে যাবে না।"

বললাম, "এসব কি বলছো কুমার? আমি আজীবন তোমার পাশে পাশে থাকবো, কোনদিন বিচ্ছিন্ন হবো না আমরা। মরার কথা কেন বলছো কুমার? জীবনের সবকিছুই তো আমাদের বাকী পড়ে রয়েছে এখনও !"

কুমার মাথা নেড়ে বললো, "জানি না। কিচ্ছু জানি না। বড় ভয় করে টুনু!"

সেদিন কুমারের হাবে-ভাবে-আদরে-ব্যবহারে কি এক উন্মাদ উন্মাদনার পরশ পেয়েছিলাম, যার অর্থ সেদিন বুঝতে পারিনি। পরে আর বুঝতে চাইনি, সবই নিরর্থক হয়ে গেছে তখন ----।

বাক্স-বিছানা নিয়ে যখন বাড়ি পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে হয় হয়। মা আমার সাড়া পেয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

একমুখ হেসে বললেন, "যাক্ বাবা, পড়াশোনার হাত থেকে মুক্তি এবার। বইপত্তর সব টেনে আনিসনি তো?"

বাবা ঠাট্টা করে বললেন, "বল কি? এখনই বইপত্তর বেচে বিলি করে বসে থাকবে নাকি? শেষে যদি পাশ না করে?"

বললাম, "ভেবো না, নিশ্চয়ই পাশ করবো। তবে বইগুলো এখনও হাতছাড়া করিনি। হস্টেলেই জুনিয়ার একটা মেয়ের কাছে রেখে এসেছি বাক্সটা।"

মা বললেন, "ভালই করেছিস। এবার আর পড়াশোনা এমনিতেও হত না তোর।"

পাশের বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে নীচুগলায় বললাম, "বাচ্চির সতীন তো? সে আর নতুন কথা কি?"

মা বললেন, "নারে না, সে এখন অনেক ভাল হয়ে গিয়েছে। নিজেরও একটি পেটে এসেছে তো ! আর চেঁচামেচি করে না। আমি বলছি বড় বাড়ির কথা। ওবাড়িতে বিয়ে লেগেছে যে। চৌধুরী সাহেবের একমাত্র ছেলে, সারা সম্পত্তির ওয়ারিশ, কুমার রূপনারায়ণের বিয়ে। তাও আবার বল্লভগড়ের রাজকন্যের সঙ্গে। সোমবার তিলক চড়াবে, আঠারো তারিখে বারাত। একমাস আগে থেকেই ধূমধড়াক্কা লেগে গেছে।

তা করবে না কেন, টাকার কমতি নেই তো ----।"

বাবা বললেন, "শুধু টাকা নয়, প্রেস্টিজের প্রশ্নও আছে। বল্লভগড়ের রাজা যে সে লোক নয়। বেয়াইয়ের সামনে মুখরক্ষা করতে হবে তো চৌধুরী সাহেবকে ----।"

কোথায় যেন পড়েছিলাম প্রত্যেক মানুষের বাহ্যিক শক্তি সামর্থ্যের অন্তরালে অন্তহীন শক্তির ভাণ্ডার লুকানো থাকে। সাধারণ সময়ে তার হদিশ না পেলেও, দরকারের সময় ঠিক তার চাবিকাঠিটি হাতে চলে আসে। এ যে কি নিদারুণ সত্য, তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ঘটলো সেবারই। অন্যথা পিলি কোঠির প্রতিসন্ধ্যার আলোকসজ্জা আর সুসজ্জিত ব্যাণ্ডের উদ্দাম সঙ্গীত নিয়ে নানা মন্তব্য, সজীব আলোচনা চালিয়ে যাবার অমানুষিক অপার্থিব শক্তি আমায় জোগালো কে?

তিলকের দিন সন্ধ্যাবেলা পাড়াপ্রতিবেশিনীদের সঙ্গে ছাদে উঠে নীচু আলসের উপর বসলাম সার বেঁধে। তরল হাস্যপরিহাসে মুক্ত গগনের নীচে উৎসবের তরঙ্গ দোলা দিয়ে গেল আমাদের অপরিসর ছাদে ভিড়-করা উৎসুক মহিলাবৃন্দকে।

তেওয়ারী গিন্নি মাকে বললেন, "তোমার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছো কবে গো? বিয়ের মরশুম চলছে, এই বছরেই লাগিয়ে দাও।"

মা বললেন, "কি করবো দিদি, মেয়ের আমার বিয়ের দিকে ঝোঁকই নেই মোটে। বলছে, ডাক্তারী পাশ করে বিলেত যাবে আরও লেখাপড়া করতে।"

তেওয়ারী চাচি আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "ওমা, তাই নাকি?"

হাসিমুখে বললাম, "তা নয় তো কি? অন্য দেশে মেয়েরা সর্ব বিষয়ে ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলে। এদেশেই শুধু গুষ্টিবর্গের রান্না রেঁধে, হেঁসেল কেড়ে কাটে তাদের জীবনভোর।"

পিলি কোঠির গেটে বাজনা বাজছে; আলোয় আলোময় চতুর্দিক। রঙীন পোষাক পরা দাসদাসীরা থরে থরে দামী দামী জিনিসপত্র বয়ে আনছে। কন্যাপক্ষের তরফ থেকে তিলকের তত্ত্বতলাস এসব। গেটের সামনে জুড়িগাড়ি, তার পিছনে আরও কত কত গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

জিনিসপত্রে, মানুষে ঠাসা। গরদের ধুতি পরা পুরোহিতকে পাশে নিয়ে বল্লভগড়ের রাজাসাহেব নামলেন সোনার জরির কাজ করা টুপি-নাগড়া, সিল্কের চোগা চাপকান আর রূপোর ছড়িতে সুসজ্জিত হয়ে। রাজত্ব না থাকলেও রাজসিকতা এখনও বজায় আছে ষোল আনা। রাজা সাহেবের পাশে পাশে চলেছেন পার্শ্বচরেরা। উপযুক্ত ঠাটে-বাটে, বসনে-ভূষণে। চৌধুরী সাহেবও দলবল নিয়ে মজুত আছেন সুযোগ্য অতিথিদের যথাযোগ্য সম্মানার্থে। গেটের মধ্যে ঢুকে বাঁদিকে যে জমিটা পরে, সেখানে বিরাট শামিয়ানা খাটানো হয়েছে। অনুষ্ঠানের সারা সরঞ্জাম প্রস্তুত সেখানে। ছাদের আলসেয় বসে দেখছি আমরা। ব্যালকনির সিটে বসে সিনেমা দেখার মত। এতটুকু বাধা নেই কোথাও।

হঠাৎ আমার পার্শ্ববর্তিনী প্রতিবেশিনীরা উসখুস করে উঠলো। অন্দরমহলের দ্বারপথে কাদের যেন দেখা গেল। ছোটি বহুকে মধ্যমণি করে ঘোমটা ঢাকা অন্তঃপুরচারিণীরা কাকে যেন নিয়ে আসছে। ধীর পদক্ষেপে অতি ধীরে ধীরে শামিয়ানার পানে এগিয়ে আসছে সমবেতমণ্ডলী। অর্ধপথে থেমে গেল তারা। শুধু মহিলাদের মধ্যবর্তী যুবকটি থামলো না। এগিয়ে এলো শামিয়ানার নীচে। সিল্কের চুড়িদার পাঞ্জাবী পরা, মাথায় গোলাপী পাগড়ি, গলায় আজানুলম্বিত ফুলের মালা। কুমার রূপনারায়ণ। শামিয়ানাটা হঠাৎ যেন দুলে উঠলো। গাছপালা, রাস্তাঘাট, পিলি কোঠির প্রকাণ্ড প্রাসাদ, সবাই মিলে বিকট তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দিল আমার চোখের সামনে। পরমুহূর্তে একটা বিশাল অন্ধকারের গহ্বরে তলিয়ে গেলাম আমি ----।

তবে চিরদিনের মত নয়। মার্জারের নবম জন্মের মত আবার নবজন্ম নিয়ে বেঁচে উঠলাম। শুধু অত উঁচু থেকে পড়ার ফলে বাঁ পায়ের খানিকটা নষ্ট হয়ে গেল। যথেচ্ছ হেঁটে-চলে-খেলে বেড়াবার দিন শেষ হ'ল চিরতরে। আরও যা শেষ হ'ল, তার খবর পেল না কেউ। সেই খতিয়ানের খাতা বুকের নিভৃতে চেপে ধরে ফাঁকি আর বুজরুকি, ছলনা আর আত্মবঞ্চনা দিয়ে কেটে গেছে অধিকাংশ জীবন। আর যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটুকুরও পাথেয় সেই নিঃসীম শূন্যতা ----।

কামরার যাত্রীরা ফিরে এসেছে যে যার সাধ্য, সামর্থ্য, প্রয়োজন মত রসদ সঞ্চয় করে। একজন শুধোলো, "মাইজী , নামলে না এখানে?"

নীরবে মাথা নাড়লাম।

পাশে রাখা ক্রাচটার দিকে চেয়ে লোকটি সমবেদনার সুরে বললো, "ভালই করেছো না নেমে। নাহক ওঠা-নামার কষ্ট পোহানো শুধু শুধু। অনজান জায়গায় গিয়ে লাভই বা কি? কেনাকাটার কিছু থাকলে আমাদের বোলো।"

আবার নীরবে মাথা নাড়লাম। মাথার ভিতর "অনজান" কথাটা হাতুড়ি ঠুকতে লাগলো যেন। একদিন যা আমার সবচেয়ে জানা জায়গা ছিল, আজ তাই "অনজান" হয়ে গেছে ভাগ্যের বিকৃত পরিহাসে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

কামরার লোকেদের শুধোলাম, "কি ব্যাপার? কি হয়েছে?"

একগাল হেসে একজন বললো, "ট্রেন চলছে। খবর এসেছে যে পাটনার পথেই জল আছে শুধু। অন্যদিকে জল নেমে গেছে, লাইনও মেরামত হয়ে গেছে, যেখানে যা ভেঙেচুরে গেছিল বন্যার দরুন। মোগলসরাই থেকে গয়া লাইন হয়ে যাচ্ছে এ গাড়ি। গার্ড সাহেব এসে বলে গেছে। আরা-দানাপুর-পাটনার যাত্রীরা বক্সারেই নেমে গেছে সব। তুমি তো মাইজী হাওড়া যাচ্ছ, তাই তোমায় ঘুম থেকে ডেকে তুলিনি আমরা। তুমি এই গাড়িতেই হাওড়া অবধি যেতে পারবে।"

কামরার অন্যপ্রান্ত থেকে আবার বিকট চিৎকার ভেসে এলো।

উঠে ক্রাচে ভর দিয়ে সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে শুনলাম ওরা বলছে, "ও কিছু না মাইজী, একটা পাগল আওরাৎ চেঁচাচ্ছে। বেচারার একমাত্র ছেলে নাকি বানে ভেসে গেছে ----।"

গাড়ির একাংশ পর্দা দিয়ে খুপরির মত করা। তার ভিতর থেকেই আসছে আওয়াজটা। এরা নতুন যাত্রী, আগে দেখিনি। শুনলাম বক্সার থেকে খানিক আগে উঠেছে। পর্দার আশে-পাশে কৌতুহলী যাত্রীদের ভিড়। ভিড় বাড়াতে কেমন সংকোচ হল। একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটি স্ত্রীলোক নীচু গলায় বললো, "বুড়িটার মাথার গোলমাল মাইজী। ওরা বড় ডাক্তার দেখাতে কলকত্তা নিয়ে যাচ্ছে। ছেলের শোকে মাথার গোলমাল হয়ে গেছে বুড়ির।"

বললাম, "তুমি কি করে জানলে?"

পার্শ্ববর্তিনী রহস্যময় কণ্ঠে বললো, "এসব কথা জানতে বাকী থাকে না। ওরা কি আর তোমার আমার মত সাধারণ লোক নাকি ! রইস জমিদার, ওদের হাঁড়ির খবর ওদের আগে আগে ছোটে।"

অবিশ্বাসের সুরে বললাম, "তা রইস জমিদারদের তো বিরাট দোতলা-তেতলা ইমারৎ থাকে। তাদের ছেলে বানের জলে ভেসে যাবে কি করে? সে তো ভাসে গরীব ঘরের বস্তির ছেলে, যাদের মাটির চালাঘর, এই একরত্তি কুঁড়ে।"

মেয়েলোকটি এবার গম্ভীর হয়ে গেল।

বললো, "বিশ্বাস করো মাইজী, সত্যি কথাই বলছি তোমায়। আমার বাড়িও বক্সার জেলারই এক গাঁয়ে। চৌধুরী সাহেবকে চেনে না হেন লোক নেই। এককালে গ্রামকে গ্রাম ওদের এক্তিয়ারে ছিল। যদি কোনদিন বক্সার যাও, পিলি কোঠি দেখে এসো। যে কোন রিক্সাওলা, টাঙাওলা নিয়ে যাবে তোমায়। সেই চৌধুরী সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ইনি। একটি মাত্র ছেলে, সেও প্রথম পক্ষের। পেটে না ধরলে কি হয়, সতীনের ছেলে ছিল তার নয়নের মণি। ছেলেটিও ভারি ভাল, ভারি লায়েক ছিল। সাধারণত রাজা-জমিদার ঘরের ছেলেরা বখে যায়, অনপঢ় মাতাল দুশ্চরিত্র হয়। কিন্তু চৌধুরী সাহেবের ছেলেটি যেন পূর্ণিমার নিষ্কলঙ্ক চাঁদ। চতুর্দিক থেকে সম্বন্ধ আসতে লাগলো। দেখেশুনে খুঁজে পেতে শেষ অবধি বল্লভগড়ের রাজবাড়ি থেকে মেয়ে আনলেন ওঁরা। কিন্তু ঐ যে বলে বরাত ----।"

আমার বুকের মাঝে তোলপাড় করতে লাগলো। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে বুক ফেটে মরে যাবো।

কোনরকমে বুক চিরে একটি শব্দ বেরুলো কণ্ঠ দিয়ে, "কেন?"

"কি বলবো মাইজী। বল্লভগড়ের রাজকন্যে একটা ডাইন, চুড়েল। কি যে করে দিল ছেলেটাকে। বিয়ের রাত কাটতে না কাটতেই ছেলে একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল। হাসে না, কথা বলে না, খায় না, ঘুমোয় না। কত ডাক্তার-বদ্যি-হাকিম-কবিরাজ ওষুধপত্তর করলো, কত ঝাড়ফুঁক পুজোপার্বণ কোষ্ঠিবিচার মাদুলি-কবচ। কিছুতেই কিছু হ'ল না। ছেলে দিনে দিনে শুকিয়ে দড়ি হ'ল, নির্জীব ফ্যাকাসে বরণ, ক্রমে ফিটের

ব্যামোতেও ধরলো। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলেও কেউ কিছু করতে পারলো না। রোগ সারানো দূরে থাক, এই এত বছরে রোগ নির্ণয় পর্যন্ত করতে পারলো না কেউ। পারলো না, কিংবা করলো না ভয়ে।।"

আবার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় কোনমতে বললাম, "কেন?"

"বল্লভগড়ের রাজবাড়ি মাইজী, সোজা কথা নয়। দারুণ প্রতিপত্তি ওদের। শুধু টাকার জোর নয়, সে তো চৌধুরীদেরও ছিল; কিন্তু আসলে যা ভয় পেত সবাই তা হ'ল এই - বল্লভগড়ের রাজবাড়ি ডাইনের গুষ্টি। ছোটবেলা থেকে মন্ত্র তন্ত্র, পিশাচ সাধনায় লেগে যায় ও বাড়ির মেয়েরা। সিদ্ধি পেয়ে নানা ক্ষমতার অধিকারী হয়। মানুষকে ভেড়া বানিয়ে দিতে পারে। সবকিছু ভুলিয়ে দিতে পারে ওরা। জ্যান্ত মানুষের বুকে বসে রক্ত চুষে নেয়, কেউ টেরও পায় না। দিনে দিনে ফ্যাকাসে নির্জীব হয়ে নেতিয়ে পড়ে। আত্মীয়-পরিজন ডাক্তার-বদ্যির দোরে দোরে ঘুরে মরে।"

"তারপর?"

"তারপর এই গত শনিবার দিন। সেদিন আবার অমাবস্যা। জানো তো মাইজী, চুড়েলরা এই দিনে মড়াকে জাগিয়ে তুলে তার সঙ্গে যুগল নৃত্য করে। তা বন্যায় তো সারাদেশ ভেসে গেছে। কোথায় বা শ্মশান আর কোথায় বা গোরস্থান। এদিকে চুড়েল হোক আর যাই হোক, রাজবাড়ির মেয়ে তো, ভারি নাক-উঁচু, ভারি দেমাক। আর পাঁচটা ডাইনীর মত জলে নেমে মড়া হাতড়ে বেড়ালে তো মান যাবে তার। এদিকে মড়া না পেলে ওর নফর ভূত-পেত্নীগুলো ওরই ঘাড় মটকে রক্ত চুষে খাবে। শেষে মরিয়া হয়ে ----"

মেয়েলোকটার মুখখানা দেখতে দেখতে অবিকল বাচ্চির মত হয়ে গেল।

চোখ গোল গোল করে বললো, "শেষে নিজের মরদটাকেই কি মন্ত্র পড়ে দিল। লোকটা সজ্ঞানে দেখেশুনে পিলি কোঠির ছাদ থেকে ওদের বৈঠকখানা অবধি এগিয়ে আসা গঙ্গামাইয়ার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো ----।"

পর্দার আড়ালে চিৎকার কান্না হুলুস্থুল আরম্ভ হয়ে গেল আবার। পর্দা সরিয়ে একটি প্রৌঢ়া সবেগে বেরিয়ে এলো।

কামরার কাঠের মেঝের উপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো, "আমার ববুয়াকে এনে দাও। ওই যে ডুবে গেল ! ওরে আমার

ববুয়ারে ----।"

কাঁচা-পাকা আলুথালু চুলগুলি কপালে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। জোড়া ভুরুর নীচে টানা টানা দু'টি চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে দু'গাল বেয়ে। আশ্চর্য সুন্দর ঠোঁট দু'টি মর্মন্তুদ যন্ত্রনায় বিকৃত হয়ে রয়েছে। যেন কোন খেয়ালি শিল্পী নিজের অন্তরের নিভৃত বেদনার রঙে রাঙিয়েছে তাকে।

হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে মেঝেটা দুলে উঠলো। ট্রেনের বেঞ্চি, জানলা, যাত্রীরা, ছোটি বহু , বাচ্চি সবাই মিলে উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দিল যেন। তারপর কোথা থেকে তাল তাল অন্ধকার ছুটে এসে আমাকে চতুর্দিক হতে গ্রাস করে নিল ----।